ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪৩, ১৪৩২/২০২৫, ১৬১-১৬৮
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4309

মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন ভাবনা : প্রেক্ষিত *একাত্তরের চিঠি*

সুলতানা সুকন্যা বাশার

সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

Abstract: The growth of Bengali nationalism and the long struggle for rights finally led to the Liberation War of 1971. After many stages of protest and resistance, the Bengali people proved their strength to the world through this war. We learn about the Liberation War from many sources such as history books, novels, plays, poems, rhymes, and newspapers from both Bangladesh and abroad. Among these sources, the letters written by the freedom fighters are especially important. These letters are real historical documents that show the true experiences of the war. Many letters have been lost because they were not properly preserved, but some are still kept in the Liberation War Museum and in private collections. These letters tell us many important facts about the struggle for independence. The book *Letters of '71* includes many such wartime letters and provides valuable information about the war.The letters describe the freedom fighters' war strategies, their training, and their emotions during the war. They also show how the fighters stayed connected with their families and friends even in dangerous situations. These letters are strong evidence of how families were involved during the war, and they are important primary sources that deserve more research.This article focuses on the thoughts and emotions of the freedom fighters during the Liberation War, based on the letters included in the book *Letters of '71.*

Key Words: letters of the freedom fighters, Emotions of the freedom fighters during the Liberation War, War Strategies, Verve.

ভূমিকা:

মুক্তিযুদ্ধ বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে সন্দেহাতীতভাবে স্মরণীয় একটি ঘটনা। এ যুদ্ধ শুধু একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্য ছিল তা নয় বরং এ যুদ্ধ ছিল আত্মসম্মান অর্জনের, মাতৃভাষার দাবিতে সর্বোপরি নিজস্ব শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। অনেকেই পারিবারিক ইচ্ছায়, আবার অনেকে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করেছিল পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ যখন ক্ষতবিক্ষত; রণাঙ্গনে তেজোদীপ্ত যোদ্ধারা তখন মুক্তির নেশায় মত্ত। যুদ্ধের ময়দানে থেকেও পরিবারের নিরাপত্তার কথা তাঁরা ভেবেছেন। অনেকেই বন্ধুবান্ধবদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁদের লেখা চিঠিতে দেশকে মুক্ত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়েছে একইসাথে পরিবারের প্রতি পাকিস্তানিদের অত্যাচারের শঙ্কাও দেখা যায়। এমন ৮২টি চিঠি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে *একাত্তরের চিঠি*। এ চিঠিগুলি যেন সকল মুক্তিযোদ্ধার সার্বিক পরিস্থিতির প্রতিনিধিত্ব করছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক দৃঢ়তা, দেশপ্রেম এবং পরিবারের নিরাপত্তা বিধানের সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য:

নির্দিষ্ট গ্রন্থকে গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করায় গবেষণা প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে প্রকাশিত পত্রসমূহের ক্ষেত্র ব্যাখ্যা করতে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর আলোকে দেখা যায় দেশের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধরত যোদ্ধারা চিঠিতে মূলত যুদ্ধ পরিস্থিতি, প্রশিক্ষণ গ্রহণ, প্রতিদিনের খাবারের বিবরণ, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের কবল থেকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ মুক্তিলাভ পরবর্তী দেশ গঠনে কীরূপ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার– এমন বিষয়ে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছেন যা নিয়ে বিশদ কাজ করার প্রয়োজনবোধ করেছেন গবেষক। মুক্তিযুদ্ধের স্থিরচিত্র, পত্রপত্রিকার বিবরণসহ তৎকালীন গল্প উপন্যাসে যুদ্ধের বহু তথ্য পাওয়া গেলেও যোদ্ধাদের লিখিত পত্র নিয়ে একক গবেষণা হয়নি, এক্ষেত্রে আলোচ্য প্রবন্ধটির যৌক্তিকতা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রবন্ধটিতে *একাত্তরের চিঠি* গ্রন্থটি প্রাথমিক উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ সমৃদ্ধ অন্যান্য গ্রন্থের তথ্য দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা:

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সালাহউদ্দীন আহমেদ সম্পাদিত *একাত্তরের চিঠি* গ্রন্থের পূর্ণ সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে এ প্রবন্ধে। এছাড়া হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, আবুল হাশেম চৌধুরীর *যুদ্ধে যুদ্ধে একাত্তরের নয় মাস*, রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম রচিত *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, এম আর আখতার মুকুল সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধে আলোকচিত্র*, হাসিনা আহমেদের *১৯৭১: মুক্তিযুদ্ধের পত্রপত্রিকা*, মুনতাসীর মামুন রচিত *মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিলপত্র* সহ আরও কিছু সমৃদ্ধ গ্রন্থের তথ্যাবলির সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। এ প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধের সময় লিখিত চিঠির মাধ্যমে তৎকালের পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস দেখা যায় বিধায় এটি প্রকাশের যৌক্তিকতা রয়েছে।

***একাত্তরের চিঠি* গ্রন্থের আলোকে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন ভাবনার বিশ্লেষণ:**

প্রথমা প্রকাশনীর উল্লিখিত গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে মোট বিরাশিটি চিঠি যার মধ্যে দুটি চিঠির বঙ্গানুবাদ রয়েছে। আবেগঘন চিঠিসমূহে মুক্তিযোদ্ধার মানসিক শক্তি, স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষাসহ পারিপার্শ্বিক আরো কিছু বিষয় উঠে এসেছে। *একাত্তরের চিঠি* গ্রন্থের ৮২টি চিঠির মধ্যে মোট ৩৪টি চিঠি লেখা হয়েছে মা-বাবাকে সম্বোধন করে। বেশির ভাগ চিঠিতেই মুক্তিযোদ্ধারা স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে যুদ্ধে যোগ দিতে আসার কথা উল্লেখ করে পিতামাতার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। যুদ্ধকালীন অস্থিরতার মাঝেও তাঁরা পিতামাতাকে সাহস জোগানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং পরিবারের ছোট ভাই-বোনদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধও করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা আমানউল্লাহ চৌধুরী ফারুক (তখন দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন) পিতার নিকট ক্ষমা চেয়ে লিখেছেন যে, দেশের এ হেনতর সংকটের সময় ঘরে বসে থাকাটা তাঁর জন্য মানসিক অপরাধের সামিল, তাই তিনি যুদ্ধে চলে এসেছেন এবং দেশকে মুক্ত করে ফিরে আসলে গাজী হবেন। আর যদি শহিদ হন তবে তো তিনি স্বর্গের কাছাকাছি চলে যাবেন বলে উল্লেখ করেছেন। শহিদ কিংবা গাজি উভয়ই তাঁর জন্য এবং তাঁর পিতামাতার জন্য সম্মানের তাই তিনি ন্যায়ের পথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।[১]

দেশের সংকটে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নেবার বয়স তাঁর না হলেও বোঝা যায় পাকিস্তানের গণহত্যা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁর মন বিষিয়ে উঠেছিল এবং অদমনীয় মানসিক শক্তি তাঁকে মুক্তিযুদ্ধে ধাবিত করেছিল (আরো দেখুন- ১৮ নভেম্বর ১৯৭১, ৫নং সেক্টর থেকে লিখিত জনৈক মুক্তিযোদ্ধার প্রেরিত চিঠিতে তাঁর পিতাকে পরিবারের সকলের প্রতি সচেতন থাকার অনুরোধ সহ দেশ স্বাধীন না হলে জীবনের মূল্য থাকবে না বলে অবহিত করেন)।[২] বাড়ির উঠানে খেলতে গিয়ে সামান্য ব্যথা পেয়ে যে ছেলে কেঁদে বাড়ি মাথায় তুলত সে ছেলে ঠিকই যুদ্ধের ময়দানে শত আঘাত সহ্য করে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় দেশসেবায় নিয়োজিত তা যেন তাঁর মা হাসিমুখে মেনে নেন। "বাংলার স্বাধীনতা আসিলেই আমি আপনাদের কোলে ফিরিয়া আসিবো"।[৩] এমন অবিচল আত্মত্যাগী বহু মুক্তিযোদ্ধার আশা জাগানিয়া চিঠিতে দেখা যায় পরিবারের ছোট ভাইবোনদের প্রতি সচেতন থাকার আহ্বান করেছেন কেউ কেউ। আবার পত্রবাহককে ভালোমন্দ খাবার খাওয়ানোর কথা লেখা আছে কিছু চিঠিতে।[৪] যুদ্ধের ডামাডোলে যোদ্ধারা সহযোদ্ধাদের প্রতি কতটুকু দরদি ছিলেন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এসব ঘটনায়।

অনেক মুক্তিযোদ্ধা শত্রুমুক্ত এলাকা থেকে বাবা-মায়ের কাছে চিঠি লিখেছেন যেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সময় ত্বরান্বিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। স্বাধীনতার পর যখন বাড়ি ফিরবে তখন বাবার পাঞ্জাবি, মায়ের শাড়ি, বোনের চুড়ি আর ভাইয়ের জন্য দেশের পতাকা নিয়ে বাড়ি ফেরার অভিপ্রায় প্রকাশ করা যোদ্ধার মনের আড়ালে রয়েছে এক দায়িত্ববান মানুষের প্রতিচ্ছবি।[৫] যুদ্ধের বীভৎসতায় প্রাণ বাঁচাতে মানুষ যখন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানরত, তখন হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাসহ নিরস্ত্র মুসলমানদের ওপর পাকিস্তানি সামরিকবাহিনী অত্যাচার করে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছে প্রতিনিয়ত।[৬] পরিবারের যুবতি মেয়েদের জোরপূর্বক পাকিস্তানি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া, বিশেষ করে হিন্দুদের প্রতি তাদের এহেন হীন আচরণের বহিঃপ্রকাশ দেখা যেত বেশি। নারীদের ওপর এমন ঘৃণ্য অপরাধ চলাকালে মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়ে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মায়ের কাছে একজন নারীর সম্মান বাঁচানোর প্রচেষ্টায় স্বীয় সাফল্যের কথা জানিয়েছেন এক মুক্তিযোদ্ধা।[৭]

খুলনার ডুমুরিয়া গ্রামের রেবারাণী নাথ তাঁর সাক্ষাৎকারে জানান– ভারতে শরণার্থী হিসেবে যাওয়ার পথে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গাড়ির সামনে পড়ে গেলে দলের যুবকদের লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং মেয়েদেরকে তাদের সেনাক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। সে ক্যাম্পে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া বহু মেয়েকে আগে থেকেই আটকে রাখা হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর যৌনক্ষুধা মেটানোর পর সেসব মেয়েদেরকে তারা রাজাকারদের হাতে তুলে দিত এবং রাজাকাররা একজন করে মেয়েকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করত। রেবারাণী আরো জানান- তিনি যে রাজাকারের ঘরে অত্যাচারিত হয়েছিলেন সে রাজাকারের বউ এবং মায়ের সহযোগিতায় তিনি ভারতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।[৮] সম্ভবত, এমন নারকীয় অত্যাচারের খবর মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিনিয়ত পেতেন বলে অনেকেই চিঠিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন পরিবারের মেয়েদের যেন পুরুষের মতো শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয়। ২৭নং চিঠিতে মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম জানিয়েছেন আশ্রয় নেয়া বাড়িওয়ালার গৃহকর্মী পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্পে তাদের অবস্থানের কথা জানিয়ে দিলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে নিমিষেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাঁদের দল।[৯] এদেশের

সাধারণ মানুষের ওপর পাকিস্তানি সামরিকবাহিনী যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল তা ভিয়েতনামের *মাই-লাই* গণহত্যার ঘটনাকে হার মানিয়েছিল।[১০]

পাকিস্তানিরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও রোজার মাসে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিল। জেলখানার বন্দিদশা থেকে ইদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে অনেকেই লিখেছেন জেলখানায় রোজার মাসেও বন্দিদের নির্মম অত্যাচার করা হতো! মুক্তিযোদ্ধারা মায়ের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থাৎ হাসিমুখে সন্তানকে যুদ্ধের ময়দানে প্রেরণের স্মৃতিকে যুদ্ধকালীন অনুপ্রেরণা হিসেবে ধারণ করে যুদ্ধ করেছেন। মায়ের কাছ থেকে ক্ষুদিরামের মতো সাহসী বিদায় নিয়ে ট্রেনিং ক্যাম্পে অবস্থান নেওয়া এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে অবুঝ শিশুরাও যুদ্ধ কী এবং কেন তা উপলব্ধি করে পিতামাতার কাছে চকলেটের পরিবর্তে রিভলভারের আবদার করবে বলে ধারণা করেন অনেক যোদ্ধা।[১১] ৩৯নং চিঠিতে পিতার কাছে মুক্তিযোদ্ধা পুত্র পত্রবাহকের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই চিঠিতে পুত্র পিতাকে বর্ডারের স্থানীয় বাজারে ব্যাবসা করার কথাও লিখেছিলেন।[১২]

মায়ের কাছে লেখা কর্নেল আবু তাহেরের চিঠিতে কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। তিনি তাঁর মাকে গ্রামে থাকতে অনুরোধ করেন কারণ গ্রামে খাবারের কোন অভাব নাই। যদিও খুব সচেতনতার সাথে খাবার ও পানি খাওয়ার কথা বলেছেন, যেহেতু গ্রামে ডাক্তার পাওয়া যাবে না। সকল আত্মীয়স্বজনের সাথে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে বলেও জানিয়েছেন এবং পরিবারে শিক্ষিত একজন বউ (তাঁর স্ত্রীর কথা বুঝিয়েছেন) রয়েছে বিধায় বাড়ির ছোটদের পড়াশোনার বিষয়টা তাঁর দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়ার কথাও বলেছেন। তাঁর সার্বিক সচেতনতা চিঠিতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে মুক্তিযোদ্ধা বাবা তাঁর সন্তানকে জানান, পরিবারের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন না করে যুদ্ধে যোগদান করায় কিছুটা অনুশোচনায় রয়েছেন। যুদ্ধে তিনি স্বেচ্ছায় এসেছিলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে পরিবারের ভরণপোষণের অসুবিধার জন্য তিনি মনঃকষ্টে রয়েছেন।[১৩] আঠারোতম চিঠিতে দেখা গেছে পিতা তাঁর অবুঝ শিশুকন্যার প্রতি আবেগভরা চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে তিনি মেয়ে ও মেয়ের মায়ের জন্য একটি স্বাধীন দেশ উপহার এনে দিবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। তাঁর মেয়ে যখন পড়তে শিখবে সেই সময়ের কথা ভেবেই এই চিঠি লেখা– এতে তাঁর মনের কোণে স্বাধীন দেশের লালিত স্বপ্ন এবং দেশের স্বাধীন নাগরিক হয়ে বেড়ে ওঠার অভিপ্রায় জানান মেয়ের কাছে।[১৪]

স্ত্রীর নিকট লেখা চিঠির কোন উত্তর না পেয়ে মুক্তিযোদ্ধা স্বামী তাঁর মেয়ের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন সবই করবেন বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং যুদ্ধকালীন নামাজ রোজা আদায়ে কোনো প্রকার অসুবিধা হচ্ছে না বলেও জানান। ভাইয়ের কাছে লেখা চিঠিগুলোতে ছিল যুদ্ধের বিবরণসহ কতজন সহযোদ্ধা শহিদ হলেন, কতজন পাকিস্তানি সেনা বন্দি হলো বা মারা গেল সেসবের জমাট স্মৃতি। চিঠির লেখক ও প্রাপক সকল ভাই-ই যে সহোদর ছিলেন তা নয়; কিন্তু যুদ্ধ তাঁদের রক্তের সম্পর্কের ভাইয়ের চেয়েও আপন করে তুলেছিল। এসব চিঠির মধ্যে সহযোদ্ধাদের জন্য খাবার পাঠানোর কথা, বিশ্বাসঘাতকদের কথা, নারী যোদ্ধাদের কথা উঠে এসেছে (আরো দেখুন- ১ নভেম্বর, ১৯৭১, জনৈক মুক্তিযোদ্ধার প্রেরিত চিঠিতে প্রেরক নারী সহযোদ্ধাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন)।[১৫] ৪৩তম চিঠিতে দেখা যায় একজন মুক্তিযোদ্ধা বিদেশে বসবাসরত তাঁর ভাইয়ের কাছে অনুরোধ করে চিঠি লিখেছেন যেন তিনি পাকিস্তানে ফিরে না আসেন। কেননা, বিদেশ থেকে সেসব বাঙালি শিক্ষক ও অফিসার পর্যায়ের লোকজন পাকিস্তানে গেছেন তাদের সবাইকে পাকিস্তানিরা হত্যা করেছিল।[১৬]

এমন আরেকটি চিঠিতে যুদ্ধের ঘটনা লিখতে গিয়ে লেখক লিখেছেন ভারতীয় সৈন্যরা সহযোগিতার জন্য তৈরি থাকলেও বাঙালিরা যুদ্ধে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন। সর্বোচ্চ আত্মসম্মানবোধে ঋদ্ধ এক মহান মুক্তিযোদ্ধার প্রতিচ্ছবি যেন চিঠিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

স্ত্রীর নিকট লিখিত বেশিরভাগ চিঠিতেই রয়েছে সর্তকবার্তা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যেভাবে নারীদের অপমান, নির্যাতন করছে সে বর্ণনা দিয়ে সর্বোচ্চ সর্তক থাকার অনুরোধ করেছেন। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে দৃঢ় থাকার সাহস যোগানো, যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হলে অনাগত সন্তানের নিকট তাঁর আত্মত্যাগের কথা বলা যেন সন্তান তার পিতাকে নিয়ে গর্ব করতে পারে এমন চিঠিও লিখেছেন কেউ কেউ।[১৭] সন্তানকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক শিক্ষা দেওয়ার অনুরোধ রয়েছে কিছু চিঠিতে। অনেকে যুদ্ধে বাঙালিদের অবস্থা কোনো কোনো বিদেশি পত্রিকায় ছেপেছে সেগুলোর নাম জানিয়ে পত্রিকার সংখ্যাগুলো সংরক্ষণ করার কথা জানিয়েছেন চিঠিতে।[১৮] উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখতে পাই, ২৩নং চিঠিতে সাব সেক্টর কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা বয়ড়া থেকে তাঁর স্ত্রী নীলুফার দিল আফরোজ বানুকে প্রেরিত চিঠিতে *Daily Telegraph, Time* ও *Mirror* এ প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের সংবাদগুলোর অনুলিপি সংগ্রহে রাখার কথা বলেন। চিঠির প্রেরক এতে তাঁর অবস্থানসহ ইতোমধ্যে কোনো কোনো অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন ও তার ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সাংবাদিক *Peter Bill* এর ইতিবাচক রিপোর্টের কথাও বলেছেন এ চিঠিতে। মূলত এ চিঠিতে আমরা একজন সামরিক কর্মকর্তার দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধের আন্তর্জাতিক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করি।[১৯]

৩১নং চিঠিতে টাঙ্গাইল সদর থেকে কোলাহাটের মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুল হক খান বেনুকে যোদ্ধাদের নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশনা দিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধা বুলবুল খান মাহাবুব। এতে তিনি জরুরি ভিত্তিতে কয়েকজন যোদ্ধার সাথে যোগাযোগ করার সর্বোচ্চ চেষ্টার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অস্ত্র আদান-প্রদানের উল্লেখ রয়েছে সে নির্দেশনায়। কেননা কোলাহাটের গেরিলা অপারেশন সফল করাটা অত্যন্ত জরুরি বলেছেন বারবার। এ বিষয়ে হেডকোয়ার্টারে নিয়মিত তথ্য প্রেরণের নির্দেশ রয়েছে। তাছাড়া, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জোর করে যেন চাঁদা আদায় করা না হয় সে বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে এ চিঠিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধাদের বহু বাঙালি আর্থিক সহযোগিতা করতেন। অনেক সময় খাদ্য সংগ্রহে যোদ্ধারাই অর্থ চেয়ে নিতেন। তবে কেউ সহযোগিতা প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে সেখানে জোর না করার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল।[২০] ৪৮নং চিঠিতে যুগান্তর পত্রিকার প্রতিনিধি প্রফুল্লকুমার গুপ্ত চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকার কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা এ গাফফার খানের নিকট মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক খবর প্রকাশের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা দেখা যায়।[২১]

আবার মুক্তিযোদ্ধা স্বামীর কাছে স্ত্রীরাও চিঠি লিখেছিলেন। তাঁদের চিঠির পরতে পরতে ফুটে উঠেছে আত্মমর্যাদার ব্যাপ্তি, তাঁদের স্বামী মুক্তিযোদ্ধা এ যেন তাঁদের অহংকার! সংসার খরচ বাঁচিয়ে শ'পাঁচেক টাকা স্বামীর জন্য পাঠানোর মধ্যে স্ত্রীর কী অগাধ প্রেম মিশে আছে তা অবশ্যই বোধগম্য। তাছাড়া, পৃথিবীতে নতুন অতিথির আগমনের খবর জানানোসহ দুই আড়াই বছরের বাচ্চার মুখে জয় বাংলা বলা,[২২] পতাকা উঁচিয়ে খেলা করার কথা লিখতে ভুল করেন নাই কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী।[২৩] এ যেন

যুদ্ধশিবিরে স্বামীকে আরো উৎসাহিত করা, আরো অনুপ্রাণিত করার জন্যই লিখেছেন তাঁর স্ত্রী। মুক্তিযোদ্ধা স্বামীকে যেভাবে পেরেছেন সেভাবেই সাহায্য করেছেন বহু স্ত্রী। এ যেন পরোক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশকে স্বাধীন করার এক নির্মোহ প্রচেষ্টা।

একাত্তরের চিঠি গ্রন্থে সাংসারিক বিষয়াদি কিংবা পরিবারের নিরাপত্তা সংক্রান্ত চিঠিগুলোর বাইরেও বহু চিঠি স্থান পেয়েছে সেগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত হলেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং একেবারেই সামরিক বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট। সমস্ত তথ্য যাচাই বাছাই করেই মুক্তি সেনারা যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিত বলে জানা যায়। সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের যোগাযোগ হতো নিয়মিত। কোন এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর টেলিফোনের তার কাটা হয়েছে, কোন জায়গায় বিমান হামলা হয়েছে, কোথায় জোরপূর্বক বাঙালিদের নাম রাজাকারের খাতায় উঠানো হচ্ছে, আহত সৈন্যদের কোথায় চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে এবং আহত সৈন্যরা ও তাদের দলের পরবর্তী যুদ্ধ-পরিকল্পনা, সৈন্য পুনর্বিন্যাস করার কথা চিঠির মাধ্যমে জানাতেন। সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত চিঠি লেখা হতো যেখানে অর্থের প্রয়োজন বোঝানো হতো, নতুন যোদ্ধাদের জন্য অস্ত্রের কথা বলা হতো (আরো দেখুন- মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য সাংকেতিক বার্তার প্রচলন ছিল। যার প্রমাণস্বরূপ আমরা বলতে পারি চট্টগ্রাম রেলওয়ে পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত রেলওয়ে বাংলো থেকে রফিকুল ইসলাম বীর-উত্তমের পাঠানো দুটি সাংকেতিক বার্তায় তিনি বলেছিলেন "আমার জন্য কিছু কাঠের ব্যবস্থা করো" এবং সেই সাথে দ্বিতীয় বার্তাটি হলো "আমার জন্য কিছু কাঠ নিয়ে আসো।" বার্তাদ্বয়ের মাধ্যমে শুভপুর হতে টেকনাফ পর্যন্ত ই.পি.আর. এর সমস্ত বিওপি থেকে বাঙালি ই.পি. আর সদস্যগণ পাঞ্জাবিদের ক্লোজ করে চট্টগ্রাম শহরের প্রতিরোধ কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়।[২৪] বিভিন্ন আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর শাখা-উপশাখার সঠিক খবরাখবরও সাংকেতিক শব্দের দ্বারা আদান-প্রদান করত। যুদ্ধের বিভীষিকায় ভেঙে পড়া মনোবল চাঙা করতে অনেকে বন্ধুদের নিকট চিঠি লিখত; সেসব চিঠিতে তাঁরা তাচ্ছিল্য করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে 'বন্ধু' সম্বোধনও করেছেন। আবার কেউ খিস্তিও আউড়েছেন।

মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও বন্ধুদের প্রতি শুভকামনা জানাতে ভোলেননি কেউ। আবার আগের মতো গল্প করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন তাঁদের চিঠিতে। বেশকিছু চিঠিতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আহার ও আবাসনের ব্যবস্থা কীভাবে করা যাবে সে বিষয়গুলোও উঠে এসেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সাধারণ জনগণের নিকট চাঁদা আদায় না করতে অনুরোধ করলেও হাট থেকে যোদ্ধারা খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে চাইলে যেন কোনেভাবেই বাধা দেয়া না হয় এমন নির্দেশও ছিল চিঠিগুলোতে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে কীভাবে আবার ছাড়া পেল, জোহা হলে কীভাবে অত্যাচার করা হতো সেসব তথ্য জানা যায় চিঠির মাধ্যমে। জনৈক কাকাবাবুকে সম্বোধন করে ১৪নং চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে– ক্যাম্পের যোদ্ধাদের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ, ঔষধ, ফিনাইল এবং মেয়েদের পরনের শাড়ি জোগাড় করে আনার কথা। যুদ্ধ শিবিরে মহিলা যোদ্ধাদের অংশগ্রহণের বহু প্রামাণিক দলিল রয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– মুক্তিযোদ্ধাদের আলোকচিত্র গ্রন্থের ৯০তম ছবিতে অস্ত্র হাতে শাড়ি পরিহিত মেয়েদের একটি আলোকচিত্র রয়েছে।[২৫] একই গ্রন্থের ৪৮তম চিঠিতে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *যুগান্তর* পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধি প্রফুল্লকুমার গুপ্তের

লিখিত চিঠি থেকে জানা যায় তিনি মুক্তিবাহিনীর সংবাদ সংগ্রহের জন্য জনৈক মুক্তিযোদ্ধা গাফ্ফার সাহেবকে তথ্য প্রদানের আহ্বান জানান ।[২৬]

সেসময় এদেশে মূলত দু'ধরনের পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতো। একদিকে মুজিবনগর, মুক্তাঞ্চল ও অন্যান্য জায়গা থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য, মুক্তিযোদ্ধা ও জনসাধারণের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং প্রত্যাশা সৃষ্টি করে যুদ্ধকে সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে দেওয়া। অন্যদিকে পাকিস্তান সামরিক সরকার কর্তৃক প্রকাশিত অপপ্রচারমূলক পত্রপত্রিকা।[২৭] সাংবাদিক প্রফুল্লকুমার গুপ্ত প্রথম ঘরানার সাংবাদিক ছিলেন বলে স্পষ্টত প্রতীয়মান। গ্রন্থের ১২২ নম্বর পৃষ্ঠায় ৭৮তম চিঠিতে লেখক তাঁর বোন ও ভগ্নীপতির (উভয়ই ডাক্তার) নিকট যে চিঠি লিখেছেন সেটিকে মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক বিষয়াদির একটি সারমর্ম হিসেবে ধরা যেতে পারে। চিঠির শুরুতে তিনি জানিয়েছেন মুসলিম লীগের নেতারাই রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় বাগেরহাটের শান্তি কমিটির সদস্য রজব আলী ছিলেন মুসলিম লীগের কর্মী এবং তার গঠিত দলটিই সম্ভবত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম রাজাকার বাহিনী ছিল।[২৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমরা যদিও খুলনার এ কে এম ইউসুফের নাম পেয়ে থাকি প্রথম রাজাকার বাহিনী গঠনকারী হিসেবে।[২৯]

আমরা উক্ত চিঠিতে আরো দেখতে পাই কীভাবে পাকিস্তানিরা বিভিন্ন গ্রাম বা মহল্লার প্রধানদের বাধ্য করেছে নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষকে রাজাকার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করতে। শুধু তা-ই নয়, তাদের হাতে ৩০৩ রাইফেল তুলে দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিল মুক্তিসেনারা যেন কোনো ব্রিজ বা কালভার্ট ধ্বংস করতে না পারে। এর ব্যত্যয় ঘটলেই ওই গ্রামের তিন চার মাইলের মধ্যকার সমস্ত বাড়িঘর পুড়িয়ে দিত পাকিস্তান সেনাবাহিনী। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কুলিয়ে উঠতে না পেরে রাজাকারেরা যোদ্ধাদের সাহায্য করতে শুরু করেছিল বহু জায়গায়, তবে শর্ত ছিল একটাই, কালভার্ট ধ্বংস করা যাবে না। রাজাকারদের সম্পর্কে এত বিশদ তথ্য এ চিঠিতেই দেখা গেছে। তাছাড়া চিঠির শেষের দিকে ঢাকার গ্রীন রোডে সবচেয়ে বড় অপারেশনের কথাও উঠে এসেছে; যে অপারেশনে মুক্তিবাহিনী ৩২ জন পাকিস্তানি সামরিক সদস্যদেরকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল এবং এ অপারেশনের মুক্তিযোদ্ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে প্রাণে বেঁচেছিলেন। চিঠির সমস্ত তথ্যই মূলত দেশের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আপনজনকে অবহিত করার একটি প্রচেষ্টা ছিল।

উপসংহার:

একাত্তরের চিঠি গ্রন্থটিতে প্রকাশিত সমস্ত চিঠিই মূলত মুক্তিযুদ্ধের এক একটি প্রামাণ্য দলিল। জাতির সূর্য সন্তানদের হত্যা করে বাংলাদেশকে একটি মেরুদণ্ডহীন জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছিল তারা। তাদের পরাজয় নিশ্চিত জেনেও স্বাধীনতার পর একটি শক্তি বিরতিহীন চেষ্টা চালিয়ে গেছে স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাসকে ধামাচাপা দেওয়ার। উক্ত গ্রন্থের চিঠিগুলো থেকে বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে, কোন পরিস্থিতিতে আমাদের জাতীয় বীরেরা মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে গেছেন তার স্বচ্ছ ধারণা পাবে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর অত্যাচার এবং পরিবারের নিরাপত্তার চিন্তা, পরিবারের মেয়েদের জন্য উৎকণ্ঠা মাথায় নিয়েই তারা যুদ্ধ করেছেন। অনেক সন্তানই তার পিতার চেহারা দেখে নাই। আজকের এ স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম যে সার্বভৌমত্ব উপভোগ করছে তা মূলত সেসব

বীরদের অর্জন, যারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন কিংবা গাজী হয়ে ফিরে এসেছেন দেশমাতৃকার কোলে। উক্ত গ্রন্থের আবেগ মিশ্রিত চিঠিগুলো বর্তমান প্রজন্মের জন্য পাথেয় স্বরূপ। যারা যুদ্ধ দেখেনি তাদের মনে যুদ্ধময় পরিস্থিতির চিত্র ফুটিয়ে তোলার সক্ষমতা রয়েছে প্রকাশিত প্রতিটি চিঠির।

তথ্যসূত্রঃ

---

১ সালাহউদ্দীন আহমেদ (সম্পা.), *একাত্তরের চিঠি*, (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০০৯), ২১-২২।
২ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, একাদশ খণ্ড, (ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৫), ৬০৯।
৩ সালাহউদ্দীন আহমেদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, ২৯।
৪ *প্রাগুক্ত*, ৫৭।
৫ *প্রাগুক্ত*, ১০১।
৬ আবুল হাশেম চৌধুরী, *যুদ্ধে যুদ্ধে একাত্তরের নয় মাস*, (ঢাকা: আইডিয়েল পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫), ১৪১।
৭ সালাহউদ্দীন আহমেদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, ১০৬।
৮ আবুল হাশেম চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, ১৪৫-১৪৬।
৯ সালাহউদ্দীন আহমেদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, ৫৪- ৫৬।
১০ *প্রাগুক্ত*, ৩৪।
১১ *প্রাগুক্ত*, ৩৩, ৩৭।
১২ *প্রাগুক্ত*, ৭০।
১৩ *প্রাগুক্ত*, ১২৬
১৪ *প্রাগুক্ত*, ৩৯।
১৫ রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, (ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯৬), ৬১১।
১৬ সালাহউদ্দীন আহমেদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, ৭৫।
১৭ *প্রাগুক্ত*, ৪১-৪৩।
১৮ *প্রাগুক্ত*, ৪৯।
১৯ *প্রাগুক্ত*, ৪৮-৪৯।
২০ *প্রাগুক্ত*, ৬১।
২১ *প্রাগুক্ত*, ৮৩।
২২ *প্রাগুক্ত*, ৭২।
২৩ *প্রাগুক্ত*, ৭২।
২৪ রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, ১১২।
২৫ এম. আর. আখতার মুকুল (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে আলোকচিত্র*, (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮০), ৩৮।
২৬ সালাহউদ্দীন আহমেদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, ৮৩।
২৭ হাসিনা আহমেদ, *১৯৭১: মুক্তিযুদ্ধের পত্রপত্রিকা*, (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১১), ১৫।
২৮ মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিলপত্র*, (ঢাকা: অনন্যা, ২০১১), ৩১।
২৯ মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, ৪র্থ খণ্ড, (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৫), ৪২।